ইতিহাস প্রবন্ধমালা

ISSN- 2074-8663

Itihas Prabandhamala

Peer-Reviewed Journal

বর্ষ ২০, সংখ্যা ১৮, ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
Voll. 20, No. 18, Falgun 1429 Bangabda/ February 2023 AD

ইতিহাস একাডেমি ঢাকা
ITIHAS ACADEMY DHAKA

ইদ্রিস আলী : সুন্দরবন অঞ্চলের নৃগোষ্ঠী মুণ্ডা সম্প্রদায়ের খাদ্য সংস্কৃতি ৪৫৭
মুহম্মদ সায়েদুর রহমান তালুকদার : বাংলাদেশে হাওরাঞ্চলের নদনদী ৪৬৭
Dr. Sanjay Prasad : Contribution of Marwaris in the Growth of Burrabazar in Calcutta during the Second Half of the Nineteenth Century ৪৭৯
Manab Bhattacharya : Art History of Ancient Bengal and Nalinikanta Bhattasali: A Historiographical Study ৪৮৯
Umme Atia Khatun : Politicized Transgender in *The Ministry of Utmost Happiness*: A Psycho-Social Study ৪৯৭
Dr. Swati Maitra : Down the Memory Lane- the Journey of Nikhil Banga Prathamik Sikshak Samiti from 1935 to 1977 ৫০৭
Md. Kasim Uddin : The Low Performance of Students in English at a Secondary School: A case study of Tapur Char High School, Kurigram ৫২১
Utpal Biswas : Patron of Temples in a New Perspective: Case Studies of Rāḍha Bengal (16th to 19th Centuries) ৫৩৩
Dr. Niranjan Jaladas : Roots of the Marine Fishing Mechanism Developed in Indian Sundarbans ৫৫১
Rupa Ghosh : Bhumij In Assam ৫৬৫

গ্রন্থ-পর্যালোচনা

সঞ্জীব বিশ্বাস : *দাঙ্গা থেকে দেশভাগ: 'হিন্দু' বাঙালির প্রতিক্রিয়া* ৫৭৭
আয়শা জাহান : *নথিতে যশোরের জমিদারি (খ্রিষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দি)* ৫৮১

ISSN-2074-8663
ইতিহাস প্রবন্ধমালা
বর্ষ ২০, সংখ্যা ১৮, ফেব্রুয়ারি ২০২৩

সুন্দরবন অঞ্চলের নৃগোষ্ঠী মুণ্ডা সম্প্রদায়ের খাদ্য সংস্কৃতি

ইদ্রিস আলী*

সুন্দরবন উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী নৃগোষ্ঠী মুণ্ডা সম্প্রদায়ের খাদ্য সংস্কৃতি এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়। সমাজের মূল স্রোতধারায় প্রভাব বিস্তারকারী গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের কারণে মুণ্ডারা যেমন নিজেদের ভিটেমাটি হারিয়ে রিক্ত ও নিঃস্ব হয়ে পড়ছে তেমনি জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্য ধর্মের সাথে তাল মিলিয়ে চলার কারণে হারিয়ে যাচ্ছে নিজেদের সংস্কৃতি। আদি খাদ্য উপকরণের অপ্রতুলতার কারণে উপকূলবেষ্টিত নদী ও সুন্দরবনের বিভিন্ন উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণী মুণ্ডাদের খাদ্য শৃঙ্খলে জায়গা করে নিয়েছে। হারিয়ে যাচ্ছে চিরায়ত পেশা নিজস্ব রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় যথোপযুক্ত ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ এবং সরকার ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সহযোগিতার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর শিক্ষা-সংস্কৃতির সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব।

সূচক-শব্দ: মুণ্ডা, সাদ্, হাড়িয়া, সুন্দরবন, কাঞ্জি, লোকজ-সংস্কৃতি।

বাংলাদেশে বাসরত পরিচিত ও সরকারি গেজেটভুক্ত নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে মুণ্ডা সম্প্রদায় অন্যতম। উত্তরবঙ্গ সিলেটসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চল এবং খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার সুন্দরবনের কূলঘেঁষে তাদের বসবাস। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপকূলীয় মুণ্ডা সম্প্রদায়ের জন্য নিজেদের ঐতিহ্যবাহী ও মুখরোচক লোকজ খাদ্য সামগ্রী দিনে দিনে অপ্রতুল হয়ে উঠেছে। তেমনি অন্য সম্প্রদায়ের উচ্চবিত্তের আগ্রাসী মনোভাবে হারাতে বসেছে পূর্বপুরুষের আবাদকৃত সম্পত্তি। চিরায়ত সংগ্রামী ঐতিহ্য ও চেতনার ধারকবাহী এ সম্প্রদায়ীরা নিজেদের মূল আবাসভূমি ছোটনাগপুর, রাঁচি থেকে যেমন জমিজমা হারিয়ে উচ্ছেদের শিকার হয়েছে, তেমনি তাদেরই একটি দল আবাদ কেটে সুন্দরবন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করলেও তাদের পরিণতি হয়েছে আগের মতই। আধুনিকতার ছোঁয়া, অন্য সম্প্রদায়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলা প্রভৃতি কারণে নিজেদের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটছে মুণ্ডা সম্পদায়ের। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে খুলনা জেলার কয়রা ও সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার সুন্দরবন উপকূলীয় মুণ্ডা সম্প্রদায়ের লোকজ খাদ্য সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ফোকলোর বিষয়ক ষাণ্মাসিক পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ: প্রথম সংখ্যায় কক্সবাজার ও বরিশাল জেলার লোকজ খাদ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কক্সবাজারের লোকজ খাদ্য নিবন্ধে শাক-সবজি, তরকারি, মসলা, বন থেকে আহরিত খাদ্য, মাছ, মিষ্টি ও রাখাইন উপজাতিদের লোকজ খাদ্য সংস্কৃতির বর্ণনা ফুটে ওঠে।

---

* প্রভাষক, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ, সাতক্ষীরা, বাংলাদেশ।

CamScanner

[২]অন্যদিকে বরিশালের লোকখাদ্য শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধে বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন রকমের পিঠা-পুলি, মোরব্বা, আচার ও মুখরোচক মিষ্টান্ন সামগ্রীর পাশাপাশি মাছ এবং উদ্ভিজ্জ থেকে প্রস্তুত তরকারির বিভিন্ন রেসিপির আলোচনা এসেছে।[৩] কিন্তু সুন্দরবন উপকূলবর্তী পিছিয়ে পড়া মুণ্ডা নৃগোষ্ঠীর লোকজ খাদ্য সংস্কৃতি নিয়ে প্রচলিত গ্রন্থ ও জার্নালে খুব বেশি বর্ণনা চোখে পড়েনা।

মুণ্ডা বা মার্না উপজাতি ভারতের সবথেকে পরিচিত উপজাতিদের মধ্যে অন্যতম। সব থেকে বেশি মুণ্ডা বসবাস করে ভারতের ছোটনাগপুরের মূলভূমিতে।[৪] ছোটনাগপুর ছাড়াও মুণ্ডাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পশ্চিম বাংলা, আসাম, নেপাল ও বাংলাদেশে।[৫] মুণ্ডাদের নিজস্ব ভাষা, ইতিহাস, সমাজকাঠামো, ধর্ম ও সংস্কৃতি রয়েছে। সংখ্যাধিক্যের বিচারে মুণ্ডারা ভারতে উল্লেখযোগ্য হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামগুলোতে মুণ্ডারা শত শত বছর ধরে বসবাস করে আসছিল। বিগত দুশো বছরে মুণ্ডাদের জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া-তার মধ্যে সবথেকে অন্যতম ও হৃদয়বিদারক। যার জন্য ব্রিটিশ সরকার ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদেরকে বেশি দায়ী করা হয়ে থাকে।[৬]

পূর্বপুরুষের ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে মুণ্ডারা জীবন-জীবিকা হারানোর পাশাপাশি তাদের স্বতন্ত্র সমাজ কাঠামো ও সংস্কৃতি থেকেও ক্রমান্বয়ে দূরে সরে আসে। জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারে মুণ্ডারা একসময় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার পাশাপাশি একটা অংশ বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে চলে আসে। ১৮৭২ সালের আদমশুমারিতে মুণ্ডারা রাজশাহী জেলার আদিবাসী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।[৭] শিরীণ খান তাঁর এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, এ অঞ্চলে মুণ্ডাদের বসতি স্থাপন নিয়ে বিভিন্ন উৎসে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা পাওয়া যায়। HRCBM (Human Rights Congress for Bangladesh Minorities) এর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়খণ্ড, বাকুড়া, নাগপুর, বীরভূম, পুরুলিয়া, সাওতাল পরগনা, এবং মেদিনীপুর জেলা হতে মুণ্ডারা পূর্ববঙ্গে এসেছে। পূর্ববঙ্গে মুণ্ডাদের আগমন সম্পর্কে তিনটা ধারণা প্রচলিত আছে। প্রথমত, ঝিনাইদহ জেলার (প্রাচীন যশোর) কালিগঞ্জের নলডাঙ্গার রাজা মুণ্ডাদের পূর্ববঙ্গে নিয়ে এসে রাজদরবারের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে পরিচিত করায়।

---

২ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, 'কক্সবাজারের লোকজ খাদ্য', *বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা*, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১), পৃ. ১৪১-১৪২।

৩ ফারজানা আহমেদ, 'বরিশালের লোকজ খাদ্য', *বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা*, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১), পৃ. ১৪১-১৪২।

৪ H.H. Risley, *Traibes and Castes of Bengal*, Calcutta: Firma Mukhopadhyay, 1981, p.101.

৫ বদরু মোহাম্মাদ খলেকুজ্জামান, *তালা উপজেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য*, ঢাকা: প্রতিভা প্রকাশ, ২০১৬, পৃ. ৫৬।

৬ বদরু মোহাম্মাদ খলেকুজ্জামান, *তালা উপজেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

৭ বদরু মোহাম্মাদ খলেকুজ্জামান, *তালা উপজেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

CS CamScanner

দ্বিতীয়ত, ১৮৫০ সালের সাওতাল বিদ্রোহের ব্যর্থতার পরে ব্রিটিশ শাসকেরা মুণ্ডাদের নীলচাষ করার জন্য পূর্ববঙ্গে নিয়ে আসে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভূপতিরা মুণ্ডাদেরকে সুন্দরবন অঞ্চল পরিষ্কার ও বাঁধ তৈরি করে সেই অঞ্চল লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বন্ধ করে চাষ ও বসবাস উপযোগী করার জন্য এদেশের সুন্দরবন অঞ্চলে নিয়ে আসে। একেবারে সুন্দরবনের নিকটবর্তী বসবাসরত মুণ্ডা সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীদের সাথে কথা বলে যা জানা যায় তা হল, তাদের পূর্ব-পুরুষের বসতি মূলত ভারতের বিহারের রাঁচি জেলায়। তৎকালীন জমিদারেরা জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য তাদেরকে সুন্দরবন অঞ্চলে নিয়ে আসেন। জঙ্গল পরিষ্কার করে অনাবাদী জমি আবাদ ও চাষের উপযোগী করাই ছিল মূলত তাদের কাজ।[৮]

গাজী আজিজুর রহমান (২০১২) তাঁর এক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, আঠারো শতকে সুন্দরবন অঞ্চলে এক জমিদার কৃষি আবাদের জন্য কিছু মুণ্ডাকে চুক্তিভিত্তিক রাঁচি থেকে সুন্দরবন অঞ্চলে নিয়ে আসেন।[৯] সুন্দরবন উপকূলবর্তী খুলনা জেলার কয়রা ও ডুমুরিয়া উপজেলা ও সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর, দেবহাটা ও তালা উপজেলাতে মুণ্ডাদের বসবাস করতে দেখা যায়।[১০] শ্যামনগর উপজেলার বুড়িগোয়ালিনী, মুন্সিগঞ্জের শাটুলিয়া, ইশ্বরীপুর, কৈখালী, রমজাননগর, শ্যামনগর সদর ও গাবুরা- এই আট ইউনিয়নে মুণ্ডাদের বসতি। যেসব নদীর তীরে মুণ্ডাদের বসতি সেগুলো হল- কালিন্দী, কালিঞ্চী, মালঞ্চ, চুনো, দাতিনাখালী, খোলপেটুয়া, আড়পাঙ্গাসিয়া, মরিচ্চাপ উল্লেখযোগ্য। কয়রা উপজেলার উত্তর বেদকাশি, দক্ষিণ বেদকাশি ও কয়রা সদর ইউনিয়নে মোট ৩১০ মুণ্ডা পরিবারের বসবাস।[১১]

উপকূলবর্তী আদিবাসী মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষকে স্থানীয় অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ একসময় 'বুনো' বলে সম্বোধন করত।[১২] তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে উপকূলবর্তী এসব মুণ্ডারা ধীরে ধীরে নিজেদের পাল্টে নিচ্ছে। ছেলে-মেয়েদেরকে প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত করানোর পাশাপাশি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ ও অন্য সম্প্রদায়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলার কারণে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তারা আর 'বুনো' নামে পরিচিত নাই।

বাংলাদেশের অন্য যেসব অঞ্চলে মুণ্ডারা বসবাস করে তার থেকে উপকূলীয় মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। ভাষাগত অমিলের বিষয়টা উল্লেখ করার মত। উপকূলীয় মুণ্ডারা সাদ্‌ ভাষায় কথা বলে। অন্যদিকে ভারতের রাঁচি, বাংলাদেশের

---

৮ শিরীণ খান, 'মুণ্ডা', *বাংলাদেশের আদিবাসী*, *৩য় খণ্ড* (মেসবাহ কামাল সম্পা.), ঢাকা: উৎস প্রকাশনী, পৃ. ৩৭১।

৯ গাজী আজিজুর রহমান, 'সুন্দরবনে মুণ্ডা উপজাতি', *সুন্দরবনের ইতিহাস*, *২য় খণ্ড* (রাজিব আহমেদ সম্পা.) ঢাকা: গতিধারা, ২০১২, পৃ. ২২৮।

১০ শিরীণ খান, 'মুণ্ডা', *বাংলাদেশের আদিবাসী*, *৩য় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭১।

১১ গাজী আজিজুর রহমান, 'সুন্দরবনে মুণ্ডা উপজাতি', *সুন্দরবনের ইতিহাস*, *২য় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮।

১২ সাক্ষাৎকার: আশেক ইলাহি (৬৫), প্রতিষ্ঠাতা, প্রগতি (এনজিও), সম্পাদক, দৈনিক দক্ষিণের মশাল, তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ৩০ ডিসেম্বর, ২০২০।

CamScanner

রাজশাহী ও সিলেট অঞ্চলের মুণ্ডারা মুণ্ডারি ভাষায় কথা বলে। এছাড়া এ অঞ্চলের মুণ্ডাদের কথা বলার ক্ষেত্রে এক ধরনের বিশেষ টান লক্ষ্য করা যায়, যা অন্য অঞ্চলের মুণ্ডাদের মধ্যে নেই।[১৩] উপকূলীয় অঞ্চলের মুণ্ডাদের মধ্যে নিজেদেরকে বিভিন্ন ভাবাদর্শ ও ধর্মীয় দর্শনে সম্পৃক্ত করার প্রবনতা লক্ষ্যনীয়। এ অঞ্চলের মুণ্ডারা সনাতন ধর্মে অনুপ্রবেশের পাশাপাশি সৎসঙ্গ দীক্ষা, অনুকূল ঠাকুরের দীক্ষা, বৈষ্ণব ধর্মের দীক্ষা, ওড়াকান্দী দীক্ষা-প্রভৃতি চেতনায় নিজেদেরকে শামিল করছে। অপরদিকে উত্তরবঙ্গের মুণ্ডাদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম অনুসরনের প্রবণতা বাড়ছে।[১৪]

উত্তরবঙ্গের মুণ্ডাদের নিকট শিয়াল, গুইসাপ, সজারু, বেজি, বাগঢাশা (খাটাশ) মুখরোচক খাবার হলেও উপকূলীয় মুণ্ডারা অপর্যাপ্ততার কারণে এসব খাবার থেকে বঞ্চিত হয়। আবার উপকূলের মুণ্ডারা শুধু হাঁড়িয়া মদে অভ্যস্থ থাকলেও অন্য অঞ্চলের মুণ্ডারা হাড়িয়ার পাশাপাশি *চুল্লী* পানেও অভ্যস্ত।[১৫] এছাড়া উপকূলের মুণ্ডারা জীবন-জীবিকা, শিক্ষায় অগ্রসরতা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা, জনপ্রতিনিধিত্ব, চাকরিতে অংশগ্রহণ, নিরাপদ জীবিকা গ্রহণ প্রভৃতি দিক থেকে পিছিয়ে থাকলেও দেশের অন্য অঞ্চলের মুণ্ডারা তা নেই। উপকূলের দিনমজুর মুণ্ডাদের জীবন অনেকটা সংগ্রাম মুখর। নদী ভাঙন আর নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবন অতিষ্ঠ তাদের। নেই নিজেদের নিজস্ব কোনো জমি। বেশিরভাগ মুণ্ডা পরিবার বাস করে সরকারি খাস জমিতে। এক সময় মুণ্ডাদের অনেক জমি ছিল। সেই জমি থেকে উৎপন্ন ফসলে সংসার তাদের ভালোই চলত। সাথে ছিল পুকুর ভরা মাছ ও গোয়াল ভরা গরু। জমির জন্য মুণ্ডাদের নিজস্ব কোনো দলিল ছিলনা। জমিদারদের নিকট থেকে সংগৃহীত 'পাটা' সবাই সংরক্ষণ করতে পারেন নি। আবার জমির খাজনা সময়মত পরিশোধ না করতে পারায় জমি নিলাম হয়ে গেছে। অভিযোগ রয়েছে যে, অন্য সম্প্রদায়ের স্থানীয় মানুষেরা তাদেরকে ভুল বুঝিয়ে; ফাঁকি দিয়ে বা কেসের ভয় দেখিয়ে তাদের জমি কেড়ে নিয়েছে।[১৬] এসমস্ত পার্থক্যের পাশাপাশি আরও যেসব পার্থক্য অন্য অঞ্চলের থেকে উপকূলের মুণ্ডাদের মধ্যে রয়েছে তা হল- এ অঞ্চলে মুণ্ডাদের জন্য আলাদা কোনো কালচারাল একাডেমি নেই। নেই নিজস্ব কোনো কমিউনিটি সেন্টার বা বিনোদন কেন্দ্র। নিজ সম্প্রদায়ের কোনো নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও নেই যা অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়।[১৭]

মুণ্ডারা মূলত সুন্দরবন অঞ্চল আবাদের মাধ্যমে নিজেদের বসতি স্থাপন করেছিল। এ অঞ্চলে তাদের বসতি স্থাপনের শুরু থেকে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও টেকসই কর্মসংস্থানের

---

[১৩] সাক্ষাৎকার: কৃষ্ণপদ মুণ্ডা (৩৫), নির্বাহী পরিচালক, সামস (শ্যামনগর আদিবাসী মুণ্ডা সংস্থা), শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, স্থান: ঈশ্বরীপুর।

[১৪] সাক্ষাৎকার: জগদীশ মুণ্ডা (৩০), চাকরিজীবী। তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০। স্থান: বংশীপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

[১৫] সাক্ষাৎকার: বলয় কৃষ্ণ সরদার (৩০), সভাপতি, সুন্দরবন আদিবাসী মুণ্ডা সংস্থা, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ২ জানুয়ারি, ২০২১।

[১৬] সাক্ষৎকার: ঐ

[১৭] সাক্ষাৎকার: ঐ

অভাবে উন্নত ও মুখরোচক খাবার মুণ্ডাদের খাদ্য তালিকায় যুক্ত হতে পারেনি। অভাবের তাড়নায় খাল-বিল ও সুন্দরবন নির্ভর বিভিন্ন খাবারেই ভরসা করতে হয়েছে তাদের।

শাপলা-শালুক: শাপলা সিদ্ধ করে রোদে শুকিয়ে ঢেঁকিতে ভাঙ্গার পরে খোসা উঠে গেলে লাল দেখা যায়। তখন চাউলের সাথে মিশিয়ে ভাত রান্না করতে হয়। শাপলা গাছের গোড়ায় এক ধরনের একাধিক গুটির জন্ম হয় যা ধীরে ধীরে বড় হয়ে শালুকে রুপান্তরিত হয়। অনেকে আবার শালুক সরাসরি হাড়িতে দিয়ে সিদ্ধ করে খেয়ে থাকে। অভাবের তাড়নায় অনেকে বিভিন্ন ধরনের শাক (খাতা শাক, গাদো শাক) সিদ্ধ করে খেয়েছে। কলার থোড়, কলার মোচা, কলা গাছের গোড়া সিদ্ধ করে খাওয়ার প্রবণতাও দেখা যায়। কলার মোচা কেউ আবার চিংড়ি মাছ দিয়ে ভেজে রান্না করে খেয়ে থাকে।[১৮]

চিচুর মূল: যেটা সাধারণত ধান কাটার পরে মাঠে হয়ে থাকে। চিচুর গোড়া দেখতে বাদামের মত। শূকরের প্রিয় খাবার এটা। এই চিচুর মূল সংগ্রহ করে ভালভাবে ধোয়ার পরে রোদে শুকিয়ে ঢেকিতে ভাঙালে আটা হয়, যেটা স্বাদে মিষ্ট।

গমের আটা: গমের আটা থেকে ভুরু (ভাত রান্না সম্পন্ন হওয়ার আগে ভাতের উপরে গমের আটা ভিজিয়ে দেওয়া), গমের আটার রুটি, এমনকি কোনো কোনো সময় শুধু গম ভাজি খেয়েও মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ ক্ষুধা নিবারণ করেছে।

মুণ্ডাদের নিজস্ব কিছু খাবার আছে যা সাধারণত অন্য সম্প্রদায়ভুক্তরা খায়না। যেমন- শামুক (ঘুগরি), ঝিনুক (ঝিনাই), ইঁদুর (মুছা), জোংড়া, ছোট কাঁকড়া, সাদা কুঁচে, চিচুর মূল, বাদুড়। রান্নার কাজে মুণ্ডারা প্রধানত সরিষার তেল ব্যবহার করেন।

উৎসবে বা বিভিন্ন পার্বণে মুণ্ডারা কিছু বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করে থাকে। যার মধ্যে হাড়িয়া অন্যতম। এই হাড়িয়া পূজা-পার্বণ ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের নিত্য সঙ্গী। হাড়িয়া ছাড়া কোনো উৎসবের কথা মুণ্ডারা কল্পনাই করতে পারে না। এই হাড়িয়া তৈরির পদ্ধতি বেশ জটিল। হাড়িয়া তৈরিতে শুরুতে গুটি গুটি বড়ি তৈরি করে নিতে হয়। এই বড়ি তৈরির সময় তাতে নানা রকম উপকরণ লাগে। উপাদানের মধ্যে রয়েছে কুচ ও বুজ গাছের শিকড় থেকে নিঃসৃত এক ধরনের রস। যেটির একটি তিতা স্বাদের হলেও অন্যটির স্বাদ মিষ্টি। মিশ্রণ আনুপাতিক হারে সমান সমান থাকে। এরপরে এই রস আতপ চাউলের গুঁড়ার সাথে মিশানো হয়। পানি বা অন্য কোন কিছু সেখানে থাকে না। এরপর শুকিয়ে খড় বা বিচালি দিয়ে জাঁক দেওয়া হয়। বড়িগুলো খড়ের স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা শেষে সেগুলোকে রোদ্রে শুকানো হয়। এইভাবে কিছুদিন রাখার পরে বড়িতে ধীরে ধীরে টক-মিষ্টি সুবাস ছড়ায়। পরিপূর্ণরূপে ঘ্রাণ ছড়ালে বড়ি প্রস্তুত হয়েছে বলে ধরে নিতে হয়। এই পর্যায়ে আতপ চাল হাড়িতে এমন ভাবে রান্না করা হয় যে ভাতের নিচের অংশ পুড়ে যায়। খেজুরের পাটি বিছিয়ে সেই ভাত তার উপর ছড়িয়ে শীতল করা হয়। তারপর খুব সুন্দর

---

[১৮] সাক্ষাৎকার: সন্তোষ মুণ্ডা (৬০), দিনমজুর, কাটাকাঁটা, উত্তরবেদকাশি, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ২৯ ডিসেম্বর, ২০২০।

করে বড়িগুলো গুঁড়া করার পরে উন্মুক্ত-ঠান্ডা ভাতের সাথে মেশানো হয়। দুটি বড়ির গুঁড়া এক কেজি পরিমাণের ভাতের সাথে মেশানো হয়। মাটির পাতিলে গুঁড়া মিশ্রিত ভাতগুলো তিন দিন আবদ্ধ রাখা হয়। তিন-চার দিনের মধ্যে আবদ্ধ পাতিল থেকে একটি ঘ্রাণ বের হয়। আধ লিটারের পরিমাণ রস বের হয় চার কেজি চাউলের ভাতে। পনেরো লিটার পরিমাণ পানি হালকা গরম করে এর সাথে মেশাতে হয়। হাড়িয়া এভাবে প্রস্তুত হয়। পূজার সময় পূর্ব পুরুষের নাম করে হাঁড়িয়া খেতে হয়।[১৯]

মুণ্ডাদের আরেকটা বিশেষ খাবারের নাম কাঞ্জি। ছোটো মাছের সাথে রান্না করে খেতে হয় কাঞ্জি। গরম ভাতের মাড় বা ফ্যান ১ সপ্তাহ হাড়িতে ঢেকে রাখলে তা টক হয়ে গেলে সেটা দিয়ে বিভিন্ন তরকারি রান্না করা হয়। অনেক সময় অতিরিক্ত টক বানানোর জন্য এর সাথে তেতুল মিশিয়ে দেওয়া হয়। ছোটো মাছ-পুটি, ল্যাটা, চিংড়ি, কাকড়ার রান্নার সাথে কাঞ্জি দেওয়া হয়। মুণ্ডাদের বিভিন্ন উৎসবে লাল, সাদা, কালো, খয়েরি-বিভিন্ন রংয়ের মোরগ-মুরগী ও তাদের মাংস দরকার হয়।

খোলামুচি ও তেলেপিঠা: উৎসবে পিঠাপুলির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। কিছু পিঠা শুধুমাত্র বংশের উত্তরাধিকারী পুরুষরা খাইতে পারে। কিছু পিঠা আবার সবাই খাইতে পারে।

এরিয়ান: চাউল ভেজে গুড়া করে শামুক অথবা জোংড়া দিয়ে রান্না করে এ খাবার খাওয়া হয়। বর্ষা মৌসুমে শামুক যখন বেশি পাওয়া যায় তখন এ খাবারের প্রচলন বেশি দেখা যায়।

লুম্বুয়া রুটি: আটা চ্যাপ্টা করে হাতের তালুতে চাপ দিয়ে যে আকার হয়, তা তেলে ছেড়ে দিয়ে এ রুটি বানানো হয়।

সুপারির বিকল্প: সুপারি কিনতে না পারলে তালের আশ শক্ত হয়ে গেলে রৌদ্রে দিয়ে সুপারির মত কেটে সুপারির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করে মুণ্ডারা।

সিলুয়া পিঠা: পৌষ সংক্রান্তিতে মুণ্ডারা ঐতিহ্যবাহী সিলুয়া পিঠা তৈরি করেন। অল্প পরিমাণ চালের গুঁড়ায় সামান্য লবণ ও চিনি পানিতে গুলিয়ে কাই বা মন্ড বানিয়ে নিতে হয়। অল্প অল্প কাইকে গোলাকৃতি করে নিয়ে সিলুয়া পাতায় রেখে চ্যাপ্টা মতো করে পাতা দিয়ে ঢেকে ফুটন্ত পানির ভাপে সিদ্ধ করতে হয়। সিলুয়া পিঠাকে মুণ্ডারা ভাপা পিঠাও বলেন। ফুটন্ত পানির ভাপে পিঠাটি সম্পন্ন হয় বলেই ভাপা পিঠা বলা হয়। সিলুয়া পাতার বিকল্প হিসেবে কলা পাতাও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[২০]

বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপকূলীয় জীব-বৈচিত্রে নানা ধরনের পরিবর্তনের কারণে মুণ্ডাদের মুখরোচক প্রিয় সব খাবার হারিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের

---

[১৯] সাকার মুস্তাফা, 'সুন্দরবন অঞ্চলের মুণ্ডা নৃগোষ্ঠীর মনসার গান: ঝাপান', *বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা*, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২০, পৃ. ২০০।

[২০] সাক্ষৎকার: দ্বীপচাদ মুণ্ডা (৯৫) নলপাড়া, ২ নং কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ১ জানুয়ারি, ২০২১।

উচ্চতা বৃদ্ধির ও প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগ (আইলা, সিডর, ফণী, বুলবুল, আম্পান) কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে লোনা পানির প্রবেশ বেড়ে যাওয়ায় জীব-বৈচিত্র মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। লোনা পানির কারণে মুণ্ডাদের বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ যেমন- শালুক, চিচুর মূল, কচ্ছপ, নানা ধরনের শাক, হাড়িয়া তৈরীর উপকরণ কুচ ও বুজ গাছ, শূকর প্রভৃতি খাদ্য উপকরণ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে হুঁকো পানের উপকরণ।[২১]

সুন্দরবন সংলগ্ন অঞ্চলে বসতি হওয়ায় বাদাবন নির্ভর অনেক খাবার মুণ্ডাদের খাদ্য সামগ্রীর অংশ। বন নির্ভর খাদ্য তালিকার মধ্যে রয়েছে শূকর, কচ্ছপ, মেনু মাছ, জোংড়া (লাল ও বড় জোংড়া), কাঁকড়া (কয়েক ধরনের), কুঁচে (সাদা ও লাল), হরিণ প্রভৃতি। চুন বানানোর জন্য জোংড়া ধুয়ে তারপর শুকিয়ে পোড়ানো হয়। পোড়ানো ছাই থেকে তৈরি হয় চুন।[২২] ফলের মধ্যে রয়েছে-গোলফল। গোলফলের ফুল হলুদ ও লাল রঙের। ফুল থেকে বীজ হয়ে পাকার পরে সেটি তালশ্বাসের মত কেটে খাওয়া হয়। গোলগাছের শরীর জুড়ে নোনতা স্বাদ থাকলেও এই গোল গাছেই আবার মজুদ থাকে সুমিষ্ট রস।

উপকূলের মানুষ সুন্দরী ফল পুড়িয়ে ভিতরের সাদা অংশ খেয়ে থাকে। কাঁচা সুন্দরী ফল পোক্ত হলে সিদ্ধ করে কষ পানি ফেলে দিয়ে এর শ্বাস চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করে খাওয়া যায়। মাহমুদ ও অন্যরা (২০১৪) এক সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে, সুন্দরীগাছের পাতা, কাণ্ড ও শিকড় সুন্দরবন অঞ্চলের স্থানীয় মানুষেরা ডায়াবেটিস, পেটের পীড়া, বাত, চর্মরোগসহ নানা রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করে। এছাড়া সুন্দরীগাছের ছাল বেটে মাথা ব্যাথায় লাগানো হয়ে থাকে।[২৩]

সুন্দরবনের আরেকটি ফলের নাম কাঁকড়া। কাঁকড়া ফল দেখতে কলমের মত। পোড়ালে মাজ থাকে ভিতরে। অভাবের তাড়নায় অনেক ক্ষেত্রে মুণ্ডারা সুন্দরী ফল সিদ্ধ করে রান্না করে খেয়েছে। এছাড়া রয়েছে গোলফল, হেতাল খেজুরের মাতি, মধু, বাউলিয়া ফল (দুই ধরনের: ঢ্যাশফল ও বাউলিয়া ফল), হরকাচার ফুল বের করে তা থেকে নির্গত রস; যা খেতে অনেকটা মধুর মত। এছাড়া সুন্দরবনের সবথেকে বেশি আহরিত ও ভোজ্য ফল হল- কেওড়া। এই কেওড়া দিয়ে সুন্দরবনের আশেপাশের গ্রামে নোড়া, আচার, টক জাতীয় নানা নামের খাবার তৈরি হয়। কেওড়া, হেন্তাল, ধুতল, বাবলে, জানা, ছইলা,

---

২১ সাক্ষৎকার: কৃষ্ণপদ মুণ্ডা (৩৫), নির্বাহী পরিচালক, সামস (শ্যামনগর আদিবাসী মুণ্ডা সংস্থা), শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০।

২২ সাক্ষৎকার: সন্তোষ মুণ্ডা (৬০), দিনমজুর, কাটাকাঁটা, উত্তরবেদকাশি, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ২৯ ডিসেম্বর, ২০২০।

২৩ Mahmud, Imran; Md khairul Islam; Sanjib Saha, Apurba Kuma Barman, Md. Mustafizur Rahman, Md Anizuzzaman, Taufiq Rahman, abdullah Al-Nahain, Rownak Jahan and Mohammed Rahmatullah,1998. Pharmacological and Ethnomedicinal Overview f Heritierafomes: Future prospects International Scholarly Research Notice, volume 2014, Article ID 938543, p.12.

CamScanner

গোল, বান্দা, ঘড়িয়া ও হরিণ আড়ুগাছের ফল কাঁচা অবস্থাতেই খায় মানুষ। পাঁকলে এসব ফল সাধারণত খাওয়া যায়না। একমাত্র হরিণ আড়ুর ফল পাকলে খাওয়া যায়।[২৪]

সুন্দরবনের গাছের পাতা খাওয়ার প্রচলন খুব বেশি নাই। তবে সুন্দরবনে থাকাবস্থায় ভিতরের দিকে অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গা কোথাও কোথাও বনপুই ও কলমি নামের গাছ আছে। যার পাতা ও ডগা বনজীবীরা রান্না করে খান। সাগরের কাছাকাছি চরের মাঝে-মধ্যে জেইত্তপালং বা জেইদ্দপালং নামে এক প্রকার গাছ দেখা পাওয়া যায় যার পাতা শাক হিসেবে রান্না করে খাওয়া যায়।[২৫]

সুন্দরবনের ফলের মধ্যে রান্না করে খাওয়া যায় এমন ফলের পরিমাণ খুবই কম। অল্প যে দুয়েকটি ফল রান্না করে খাওয়া যায় তাঁর মধ্যে বকুলজানা গাছের ফল অন্যতম। বকুলজানা গাছে ফুল আসে সাধারণত পৌষ মাসে। ভাদ্রের শেষে ফল পাকে। বকুলজানা গাছের ফল কাঁচা অবস্থায় সজনের মত ছিলে গরম পানিতে সিদ্ধ করে কষ ফেলে দিতে হয়। তারপর কুঁচে চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করা হয়। খেতে কিছুটা পেপে সিদ্ধের মত লাগে।[২৬] সুন্দরবনের মাছের মধ্যে রয়েছে- খলসা, মল্লুল্য, কাঁটা কচ্ছপ, করাল, দাঁতনে, বাওশ, চাকুল মাছ ও অন্যান্য নদীমাতৃক মাছ।[২৭]

যুগের সাথে তাল মিলানো, শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি, আধুনিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ, অন্য সম্প্রদায়ের সাথে ওঠা-বসা প্রভৃতি কারণে এ অঞ্চলের মুণ্ডা সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব খাদ্য সংস্কৃতিকে ক্রমে ভুলতে বসেছে। ইঁদুর, বাদুড়, শূকর, শামুক, জোংড়া প্রভৃতি খাদ্য গ্রহণের কারণে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ মুণ্ডাদের সাথে মিশতে চায়না বলে উপকূলের অনেক মুণ্ডাদের অভিমত। অনেকে আবার মনে করেন, অপ্রতুলতার কারণেই মূলত এসব খাদ্য এখন মুণ্ডারা কম খায়। পর্যাপ্ত উপকরণের অভাবে মুণ্ডারা যেমন হুঁকো খাওয়া বাদ দিয়েছে, তেমনি জলবায়ু পরিবর্তন ও জীব বৈচিত্রের হুমকির কারণে শালুক, কচ্ছপ, চিচুর মূলের মত প্রিয় খাবারও অপ্রতুল হয়ে উঠছে মুণ্ডাদের কাছে।[২৮]

চর্চার অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে মুণ্ডাদের নিজস্ব ভাষা। নাগরী, সাদ্, মুণ্ডারী- আদি যে ভাষায় কথা বলত মুণ্ডারা, তার ব্যবহার খুব বেশি নেই বললেই চলে। বর্তমানে মুণ্ডারা নিজেদের মধ্যে যে ভাষায় কথা বলে তা হল সাদ্ ভাষা। উপকূলের অনেক অঞ্চলে

---

[২৪] সাক্ষৎকার: স্বর্ণবালা মুণ্ডা (৮৫), গৃহিনী, কাটাকাঁটা, উত্তরবেদকাশি, কয়রা, খুলনা। সুন্দরবন নির্ভর খাবার। তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ২৯ ডিসেম্বর, ২০২০

[২৫] সাক্ষৎকার: রাজবল্লভ মুণ্ডা (৫৫), নলপাড়া, ২ নং কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ১ জানুয়ারি, ২০২১।

[২৬] পাভেল পার্থ, 'বাদাবনের বিজ্ঞান', *প্রতিচিন্তা*, জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা, ২০১৭, পৃ. ৯০।

[২৭] সাক্ষৎকার: রামতনু মুণ্ডা (৬৫) নলপাড়া, ২ নং কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ১ জানুয়ারি, ২০২১।

[২৮] সাক্ষৎকার: কৃষ্ণপদ মুণ্ডা (৩৫), নির্বাহী পরিচালক, সামস (শ্যামনগর আদিবাসী মুণ্ডা সংস্থা), শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০।

CamScanner

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে সংকোচ বোধ করতে দেখা যায়। কোথাও কোথাও আবার অনুৎসাহিতও করা হয়। ভাষার নিজস্ব বর্ণমালার অনুপস্থিতিও এটা টিকে না থাকার একটা কারণ।

পূর্বে বিবাহ মুণ্ডারীতিতে করা হয়ে থাকলেও বর্তমানে ব্রাহ্মণের মাধ্যমে হিন্দু রীতিতে বিবাহ করার প্রবণতা লক্ষণীয়। যদিও পরবর্তীতে আবার মুণ্ডা রীতিতে বিবাহের কাজ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। কারণ হিসেবে সামাজিকতা বজায় রাখার কথা বলা হয়ে থাকে। সনাতন ধর্ম অনুসারীরা তাদের সাথে মিশবেনা বলে অনেকে মনে করেন। অনেকে বলে থাকে যে, ব্রাহ্মণ কর্তৃক মন্ত্রপূত না হলে সনাতন ধর্মানুসারীরা মুণ্ডাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে আসেন না।[২৯]

কৃষিকাজ, নৌকা চালানো, মৎস্য ধরা প্রভৃতি মুণ্ডাদের পূর্বের পেশা বর্তমানে বিলুপ্ত হবার পথে। মুণ্ডা নারীরা কঠোর পরিশ্রমী। শাশুড়ি, ননদ, নববধূ সকলে মিলে এক সাথে জমিতে কাজ করার যে রেওয়াজ ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তা আর নাই। বর্তমানে মুণ্ডা নারীরা সুন্দরবন সংলগ্ন নদীতে মাছ ধরা ও রান্নার নিমিত্তে সুন্দরবন থেকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে থাকে। এছাড়া পুকুর খনন, বাধ-বাধা, রাস্তা নির্মাণ, ইট ভাটায় শ্রমিক হিসেবে মুণ্ডারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।[৩০]

ফাদার লুইজি পাজ্জি, যিনি ২০ বছর ধরে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় বসবাসরত মুণ্ডা সম্প্রদায়ের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করে আসছেন। তাঁর মতে, বর্তমানে এ অঞ্চলের মুণ্ডারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির প্রতি আসক্ত হয়ে উঠছে। যার ফলে তাঁর নিজের সংস্কৃতি থেকে ধীরে-ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে।[৩১]

উপকূলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুভাষেদর জীবন এক অনিশ্চিয়তা ভরা। টিকে থাকার প্রয়োজনে তাদের যেমন লড়াই করতে হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে, তেমনি লড়াই করতে হয় দখলদার ভূমি দস্যুদের বিরুদ্ধে। আদিভূমি রাচি থেকে উপকূলের সুন্দরবন-কোথাও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি এ সম্প্রদায়। জলবায়ু পরিবর্তন, ফসলি জমিতে মাছ চাষের ঘের তৈরি আর সমাজের মূলস্রোতের সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে মুণ্ডাদের চিরায়ত লোকায়ত সব খাদ্য সংস্কৃতি। অদূর ভবিষ্যতে ভাষা, বর্ণমালা, ঐতিহ্য তথা স্বাতন্ত্র্য সংস্কৃতি বজায় রাখতে মুণ্ডাদের আরও বেশি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া লাগতে পারে।

---

[২৯] সাক্ষৎকারঃ কৃষ্ণপদ মুণ্ডা (৩৫), নির্বাহী পরিচালক, *প্রাগুক্ত*।

[৩০] এ. এফ. এম. আবদুল জলীল, *সুন্দরবনের ইতিহাস*, ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮৬, পৃ. ২০৪।

[৩১] সাক্ষৎকারঃ ফাদার লুইজি পাজ্জী (৭০), নির্বাহী পরিচালক, সামস (শ্যামনগর আদিবাসী মুণ্ডা সংস্থা), শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০।

CS CamScanner

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে সংকোচ বোধ করতে দেখা যায়। কোথাও কোথাও আবার অনুৎসাহিতও করা হয়। ভাষার নিজস্ব বর্ণমালার অনুপস্থিতিও এটা টিকে না থাকার একটা কারণ।

পূর্বে বিবাহ মুণ্ডারীতিতে করা হয়ে থাকলেও বর্তমানে ব্রাহ্মণের মাধ্যমে হিন্দু রীতিতে বিবাহ করার প্রবণতা লক্ষণীয়। যদিও পরবর্তীতে আবার মুণ্ডা রীতিতে বিবাহের কাজ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। কারণ হিসেবে সামাজিকতা বজায় রাখার কথা বলা হয়ে থাকে। সনাতন ধর্ম অনুসারীরা তাদের সাথে মিশবেনা বলে অনেকে মনে করেন। অনেকে বলে থাকে যে, ব্রাহ্মণ কর্তৃক মন্ত্রপূত না হলে সনাতন ধর্মানুসারীরা মুণ্ডাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে আসেন না।[২৯]

কৃষিকাজ, নৌকা চালানো, মৎস্য ধরা প্রভৃতি মুণ্ডাদের পূর্বের পেশা বর্তমানে বিলুপ্ত হবার পথে। মুণ্ডা নারীরা কঠোর পরিশ্রমী। শাশুড়ি, ননদ, নববধূ সকলে মিলে এক সাথে জমিতে কাজ করার যে রেওয়াজ ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তা আর নাই। বর্তমানে মুণ্ডা নারীরা সুন্দরবন সংলগ্ন নদীতে মাছ ধরা ও রান্নার নিমিত্তে সুন্দরবন থেকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে থাকে। এছাড়া পুকুর খনন, বাধ-বাধা, রাস্তা নির্মাণ, ইট ভাটায় শ্রমিক হিসেবে মুণ্ডারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।[৩০]

ফাদার লুইজি পাজ্জি, যিনি ২০ বছর ধরে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় বসবাসরত মুণ্ডা সম্প্রদায়ের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করে আসছেন। তাঁর মতে, বর্তমানে এ অঞ্চলের মুণ্ডারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির প্রতি আসক্ত হয়ে উঠছে। যার ফলে তাঁর নিজের সংস্কৃতি থেকে ধীরে-ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে।[৩১]

উপকূলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডাষেদর জীবন এক অনিশ্চিয়তা ভরা। টিকে থাকার প্রয়োজনে তাদের যেমন লড়াই করতে হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে, তেমনি লড়াই করতে হয় দখলদার ভূমি দস্যুদের বিরুদ্ধে। আদিভূমি রাচি থেকে উপকূলের সুন্দরবন-কোথাও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি এ সম্প্রদায়। জলবায়ু পরিবর্তন, ফসলি জমিতে মাছ চাষের ঘের তৈরি আর সমাজের মূলস্রোতের সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে মুণ্ডাদের চিরায়ত লোকায়ত সব খাদ্য সংস্কৃতি। অদূর ভবিষ্যতে ভাষা, বর্ণমালা, ঐতিহ্য তথা স্বাতন্ত্র্য সংস্কৃতি বজায় রাখতে মুণ্ডাদের আরও বেশি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া লাগতে পারে।

---

[২৯] সাক্ষৎকার: কৃষ্ণপদ মুণ্ডা (৩৫), নির্বাহী পরিচালক, *প্রাগুক্ত*।

[৩০] এ. এফ. এম. আবদুল জলীল, *সুন্দরবনের ইতিহাস*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮৬, পৃ. ২০৪।

[৩১] সাক্ষৎকার: ফাদার লুইজি পাজ্জী (৭০), নির্বাহী পরিচালক, সামস (শ্যামনগর আদিবাসী মুণ্ডা সংস্থা), শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০।

CamScanner